# বর্তমানের দুঃসহ পরিস্থিতির মোড় ফেরাতে হলে সকল বাম, গণতান্ত্রিক-প্রগতিশীল শক্তির বিকল্প রাজনীতি নির্মাণের পথে এগুতে হবে

**কমরেড খালেকুজ্জামান**

৬ জানুয়ারি '১৮ বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল–বাসদ সিলেট জেলা শাখার উদ্যোগে স্থানীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ, শহীদ সোলেমান হলে প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, গণতন্ত্রমনা-প্রগতিশীল ব্যক্তিবর্গ ও সুধী জনের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাসদ এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান। সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমান চৌধুরী, জেলা জাসদ সভাপতি লোকমান আহমদ, জেলা গণতন্ত্রী পার্টি সাধারণ সম্পাদক আরিফ মিয়া, জেলা গণফোরাম সভাপতি অ্যাডভোকেট আনসার খান, অধ্যাপক আবুল কাশেম, ডা. বীরেন্দ্র চন্দ, কেএ কিবরিয়া, সৈয়দ মনির হেলালসহ নানা শ্রেণিপেশার বিশিষ্টজন। [সমাবেশে প্রদত্ত কমরেড খালেকুজ্জামানের বক্তব্য সম্পাদনা করে উপস্থাপন করা হলো।]

কমরেড খালেকুজ্জামান তাঁর বক্তব্যে বলেন, সুধী সমাবেশে সম্মানিত অতিথিরা যারা এখানে এসেছেন, সবাইকে আমাদের দলের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমরা সব সময় চেষ্টা করি, বিভিন্ন জেলার বা প্রত্যন্ত অঞ্চলের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও নানা শ্রেণিপেশার মানুষ, যারা দেশের জনগণের কথা ভাবেন, মঙ্গলচিন্তা করেন সেই চিন্তার সাথে পরিচিত হওয়ার। সিলেটে আপনারা আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে এখানে এসেছেন, বিভিন্ন বিষয়ে মতামত রেখেছেন, তা আমাদেরকে সমৃদ্ধ করেছে। এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

সমাজ ও মানুষের প্রতি যদি ভালোবাসা না থাকে এবং কোন প্রকার দায়বোধ না থাকে, মানুষ রাজনীতি করতেই পারে না। এমনকী বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলো আজকে যারা অধঃপতিত তারাও যখন রাজনীতি শুরু করেছিলেন, মানুষের প্রতি দায়বোধ থেকে শুরু করেছিলেন। যেহেতু তাদের আদর্শবোধ ও সাংগঠনিক প্রক্রিয়াটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও তাকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে পরিচালিত তাই আজকে তারা তাদের অতীতের প্রগতিশীল ভূমিকা হারিয়ে ফেলেছে এবং জনকল্যাণ, জনসেবা, সমাজপ্রগতি ইত্যাদির সাথে তাদের একটা বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে, সে জন্য আমরা তাদের এই পতিত দশার চেহারাটা দেখি। তারা স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়কার অঙ্গীকারের জায়গা থেকে বিচ্যুত হয়েছে। কিন্তু আপনারা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, তাঁরা যেখানেই অবস্থান করুন–মানুষের প্রতি, সমাজের প্রতি একটা দায়বোধ নিয়ে আছেন।

রাজনীতি নিয়ে অনেক মত-পথ আছে, প্রতিটি দলের রণনীতি-রণকৌশল আছে কিন্তু সমাজের অপরাপর মতামত, যারা নানাভাবে চিন্তা করেন—তাদের সাথে যদি চিন্তার বিনিময় না হয়, তা হলে চিন্তার বিভ্রান্তি ও বিচ্যুতির সম্ভাবনা থাকে। বহুচিন্তার মিথস্ক্রিয়ার মধ্যদিয়ে একটা চিন্তা সঠিকতা লাভ করে, পূর্ণতা পায়। একটা সময়ে বুর্জোয়া দলগুলোও তাদের চিন্তাভাবনা নিয়ে মানুষের সাথে কথা বলতেন, মতবিনিময় করতেন, তাদের কথা শুনতেন। ফলে সেসময়ে রাজনীতির যে আবহাওয়া ছিল, আলাপ-আলোচনা, যুক্তিতর্ক ছিল, সেখান থেকে মানুষ অনেক কিছু শিখতে পারতো। রাজনৈতিক, গণতান্ত্রিক পরিবেশ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি গড়ে ওঠতো। এখন আর তারা জনগণের কথা শোনার প্রয়োজন বোধ করে না।

এখানে কথা উঠেছে, কেন আজকে ছাত্র-যুবসমাজ প্রগতিশীল বিপ্লবী সংগ্রামী ঐতিহ্যের রাজনীতি তো পরের কথা, এমনকি সাধারণ কল্যাণকামী সুস্থ রাজনীতিতেও নামছে না, এব্যাপারে তাদের কেন আগ্রহ নাই? স্বাধীনতার আগে আওয়ামী লীগের একজন নেতা-কর্মী, যখন মানুষের সামনে যেতেন, তার আচরণে একটা বিনয় প্রকাশিত হতো, মানুষও তাদের শ্রদ্ধা করতো। তারা তখন নানাভাবে মানুষকে পক্ষে আনার চেষ্টা করেছেন; তাদের মধ্যে একটা সহনশীলতা ছিল, ধৈর্য্য নিয়ে কথাবার্তা বলতেন। আজকে দেখা যায় বুর্জোয়া সংগঠনের নেতা-কর্মীরা মহড়া দিয়ে চলে। এখন তারা যেভাবে হম্বিতম্বি করে চলে, তাদের শরীরের ভাষা-ভঙ্গি এমন, যেন একটা দুর্বৃত্ত দল চলছে যা মানুষের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করে। রাজনৈতিক বিনয় থাকে না। ফলে, যে জনগণ মতামতের নির্ধারক-ক্ষমতার মালিক, যাদের মতামত নিয়ে রাজনৈতিক শক্তি নির্মাণ করতে হবে, তাদের প্রতি যে শক্তি বিনয়ী ও সহনশীল হবে না, সে রাজনীতি কখনও জনগণের কল্যাণ করতে পারে না।

গণতন্ত্রের রূপ-চেহারা কেমন? সেটা নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক চলছে; বুর্জোয়া গণতন্ত্রের দিন কি শেষ হয়েছে, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র কি ব্যর্থ হয়েছে ইত্যাদি। আমরা জানি, গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্র এই সব ধারণার উৎপত্তি ইউরোপে। সাধারণভাবে গণতন্ত্র মানে হলো, মানুষের মুক্তচিন্তা, স্বাধীনচিন্তা, সংগঠিত হওয়ার অধিকার, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অধিকার, জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা শাসন কার্য পরিচালনা করা ইত্যাদির একটা সমন্বয়। এর সাথে যুক্ত–সকল মানুষের মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও কাজ এর নিশ্চয়তা। জনগণের এই ছয়টি মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি ও প্রাপ্তির নিশ্চয়তা–সবটা মিলে গণতন্ত্রের পরিমণ্ডল। এইগুলো যদি নিশ্চিত না হয়, তা হলে একটা শাসনকে গণতান্ত্রিক বলা যায় না। আজকে এগুলো আমেরিকার ট্রাম্প থেকে শুরু

করে আমাদের দেশের শাসক পর্যন্ত কারও কাছে পাওয়া যাবে না। এখন গণতন্ত্র মানে ভোটতন্ত্র, যদিও আমাদের শাসকশ্রেণি সেটাও সুষ্ঠুভাবে করতে অপারগ।

শাসক দলের ছাত্র সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন, যুব সংগঠন–এরা এমনকী তাদের দলেরও ঘোষিত নীতি, কর্মসূচি, ইতিহাস এগুলো ভালো জানে না। গণতন্ত্রের উদ্‌গাতা কারা, তারা এর মধ্যদিয়ে কী ধরনের শাসন ব্যবস্থা দেখতে চেয়েছেন এর কিছুর সাথেই তারা পরিচিত নয়। তাদের নিজেদের মধ্যে এগুলো নিয়ে যেমন চর্চা নেই তেমনি তাদের দলও এগুলো তাদের শেখায় না। চিন্তা-চেতনার এই হাল কেন দাঁড়াল?

ক্ষমতাসীন দলের ছাত্ররাজনীতির দুর্বৃত্তায়ণ, লুটতরাজ খোলা চোখে দেখা যায়। কিন্তু একটু ভেবে দেখুন তো! এই আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ ১৯৭০ সালে প্রস্তাব পাশ করেছিল স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ। শহিদ স্বপন চৌধুরী এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং সেটা সংখ্যাগরিষ্ঠ মতে পাশ হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার যে 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' প্রচার করে সেখানে বলা ছিল—সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হবে। ৩ মার্চ পল্টনের জনসভায় ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করা হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল—দেশ স্বাধীন হলে শ্রমিকরাজ, কৃষকরাজ কায়েম হবে। আজকে এই কথাগুলোর বাস্তবায়ন কোথায়? আর তাদের অবস্থানই বা কোথায়?

ফলাফল যেটা দাঁড়িয়েছে, দুই প্রেসিডেন্ট খুন, চার জন জাতীয় নেতার জেল হত্যা, পাঁচ বার জরুরি অবস্থা, দুই বার প্রত্যক্ষ সামরিক শাসন, একবার পরোক্ষ সামরিক তদারকি শাসন, কয়েক হাজার রাজনৈতিক কর্মী ও সৈনিক হত্যা। শাসনের ক্ষেত্রে : পার্লামেন্ট পদ্ধতি স্থিতি পেলো না; আসলো প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি, তারপর একদলীয় শাসন, আসলো মার্শাল ল, সেখান থেকে মার্শাল ডেমোক্রেসি, আবার মার্শাল ল, গণঅভ্যুত্থান। দ্বিদলীয় পার্লামেন্টারি শাসন পদ্ধতি, সেখান থেকে আবার চলছে একদলীয় নিয়ন্ত্রণে মাল্টি পার্টি সিস্টেম। এগুলো শাসনব্যবস্থার একটা অস্থিতিশীল অবস্থাকে নির্দেশ করে। এখানে যে শাসনব্যবস্থা চলছে তা লুটপাটতন্ত্র, পরিবারতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের আদলে দুর্বৃত্তায়িত, দুর্নীতিগ্রস্ত ও দলতন্ত্রের গ্রাসে পতিত। এর সাথে গণতন্ত্রের রীতি-নীতির কোন সম্পর্ক নাই। গণতন্ত্রের শ্লোগান এসেছিল ইউরোপ-আমেরিকা থেকে, আজ তারাও তাদের উত্থানকালের অঙ্গীকারের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নাই। তবে তারা সারা দুনিয়াকে শোষণ করে তাই তাদের দেশে গণতন্ত্র না থাকলেও সারা পৃথিবী লুট করে, তাদের দেশের মধ্যবিত্তকে খুশি রাখতে পারে, শ্রমিকশ্রেণিকে ঘুষ দিতে পারে। এই করে তারা গণতন্ত্রের বাইরের মুখোশটাকে রক্ষা করে চলছে, নিয়মতান্ত্রিক ক্ষমতা হস্তান্তরের ঐতিহ্য রক্ষা করতে পারছে। আমাদের দেশের বুর্জোয়াদের টানাটানির সংসারে মারামারি-হানাহানি না করে তারা ক্ষমতা রাখতে বা ছাড়তে পারে না। ট্রাম্প আসার পর সবাই বলছেন, আমেরিকায় একটা পাগল আসছে ক্ষমতায়। কথাটা ঠিক না। আমেরিকার প্রশাসন এতদিন যা গোপনে করতো, রাখঢাক করে করতো, ট্রাম্প তা খোলামেলা করছে, সে তো ভিন্ন কিছু করছেন না।

১৯৯৫ সালে আমেরিকান সিনেট-কংগ্রেস সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, ইসরাইলের রাজধানী হবে জেরুজালেম। এটাকে তারা মুলা ঝুলিয়ে ব্লাকমেইল করে আসছিল, পুরা মধ্যপ্রাচ্যে রাজনৈতিক-সামরিক কর্তৃত্ব বহাল রাখার কৌশল হিসাবে। এখন যেহেতু মধ্যপ্রাচ্য হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে, তাই ট্রাম্প খোলামেলাভাবে জেরুজালেমকে রাজধানীর স্বীকৃতি দিয়ে ভিন্ন কৌশলে এগুচ্ছে। একটা কৌশল ব্যর্থ হওয়ায় আরেকটা কৌশল নিচ্ছে। আগে তারা বিশ্বব্যাংক, আইএমএফে বেশি ফান্ড দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ রাখতো, জাতিসংঘ-ন্যাটোতেও টাকার জোরে খবরদারি রাখতো কিন্তু এগুলো খোলামেলা বলতো না। এখন ট্রাম্প খোলামেলা বলছে, টাকা দিব আমরা আর তোমরা ভোট দিবে, কাজ করবে আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, তা হবে না, তাই যদি হবে আমরা আর টাকা দিব না। আগে যা কৌশলে করতো এখন করছে খোলামেলাভাবে। টমাস জেফারসন ছিলেন আমেরিকার তৃতীয় প্রেসিডেন্ট, তিনি রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মকে যুক্ত না করার নীতিতে বিশ্বাস করতেন। কারণ রাষ্ট্রের সাথে যদি ধর্মকে মিলানো হয় তা হলে গণতন্ত্র থাকে না। সেই আমেরিকা তাদের টাকায় লিখে দিল, 'আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি'। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধর্মের নামে রাষ্ট্র হতে পারে না; ভ্যাটিকান সিটি তাহলে কী করে রাষ্ট্র হয়? ইতালির রোম শহরের ভিতরে অবস্থিত ভ্যাটিকান স্বাধীন রাষ্ট্র, পোপ তার নেতা। ইসরাইল কী করে রাষ্ট্র হয়? আমেরিকা এগুলোকে অনুমোদন করছে। নির্বাচিত হয়েও সাদ্দাম যদি একনায়ক হয়, তা হলে সৌদি আরবে তো রাজতন্ত্র–গণতন্ত্রের লেশমাত্র নেই। সেই রাষ্ট্র নিয়ে, সরকার নিয়ে তো তাদের কোন বক্তব্য নেই। আজকের দিনে সাম্রাজ্যবাদী, পুঁজিবাদী দুনিয়া থেকে বুর্জোয়া অর্থেও গণতন্ত্র সারা বিশ্ব থেকেই দূরে চলে যাচ্ছে। কার্ল মার্কস বলেছিলেন, বুর্জোয়ারা যে সাম্য, মৈত্রীর শ্লোগান দিয়ে বিপ্লব করেছিল, তারা তা রক্ষা করতে পারবে না। কারণ শোষণমূলক ব্যবস্থা টিকিয়ে রেখে সাম্য রক্ষা করা যায় না। পুঁজিবাদী শোষণে শোষিত মানুষরা ক্ষমতার বৃত্তের বাইরে চলে যাবে, ক্ষমতা ধীরে ধীরে মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে চলে আসবে। সেই দিন এই কথা বুর্জোয়ারা না মানলেও আজকে সেটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ রক্ষায় ট্রাম্প ওবামার চেয়ে বেশি সফল। কারণ ওবামা পাঁচ বছরে যে পরিমাণ অস্ত্র বিক্রি করেছে ট্রাম্প অল্প সময়ে তার চেয়ে বেশি অস্ত্র বিক্রি করেছে। যেমন : ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকা খরব ছাপিয়েছে—২০১৫ সালে ৪০ বিলিয়ন ডলার অস্ত্র বিক্রির চুক্তি করেছে আমেরিকা। ওই বছর দুনিয়াজুড়ে অস্ত্র বিক্রি হয়েছে ৮০ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ, ২০১৫ সালে সারা বিশ্বে বিক্রি হওয়া অস্ত্রের অর্ধেক ছিল ওয়াশিংটনের। আর ক্রেতার শীর্ষে ছিল কাতার, মিশর, সৌদি আরব, দক্ষিণ কোরিয়া, পাকিস্তান, ইসরায়েল, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইরাক।

২০১৭ সালে অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম বিক্রিতে নতুন রেকর্ড করেছে আমেরিকা। দেশটি '১৭ সালে ৬ হাজার ৯০০ কোটি ডলার কিংবা তারও বেশি অর্থের অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম বিক্রি করেছে। ওই বছর মার্কিন কংগ্রেস ৫ হাজার ৯০০ কোটি ডলারের অস্ত্র বিক্রির অনুমোদন দিয়েছিল। 'কাউয়েন ওয়াশিংটন রিসার্চ' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রোমান শুয়েজার প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

অস্ত্র বিক্রি ছাড়া আমেরিকার অর্থনীতি টিকবে না। কারণ, এক একটা অস্ত্র কারখানায় তাদের বিনিয়োগ বিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার। ব্যাংক ঋণও ট্রিলিয়ন ডলারের। অস্ত্র বিক্রি করতে না পারলে ব্যাংক ঋণ পরিশোধ করতে পারবে না, ব্যাংক বন্ধ হয়ে যাবে, অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিবে। ২০০৭ সালের চাইতে বড় সংকটে পড়বে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব দেখে কমরেড লেনিন বলেছেন, তারা অর্থনীতিকে সামরিক অর্থনীতিতে পরিণত করেছে। ফলে, যুদ্ধ ও যুদ্ধোন্মাদনা যদি রাখতে না পারে, তা হলে তারা টিকতে পারবে না। এগুলোকে তারা প্রচার মাধ্যমের দ্বারা ভুলিয়ে রেখেছে। পালাক্রমে মন্দা পরিস্থিতিতে তারা যেভাবে নাকাল হচ্ছে, দেখে মনে হয় দিনে দিনে খণ্ড ও আঞ্চলিক যুদ্ধ ছাড়িয়ে আবার একটা বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে।

দেশের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি এবং প্রতিকূল বৈশ্বিক পরিস্থিতি মিলে আমরা একটা জটিল অবস্থায় আছি। আমাদের শাসকরা মানুষকে এমন একটা উন্মাদনার মধ্যে রাখতে চায়, যাতে তারা প্রকৃত পরিস্থিতি নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করতে না পারে। কারণ, তাদের কোন সমস্যা নেই, তাদের এক পা দেশে আরেক পা বিদেশে। ঝামেলা দেখলে তারা দেশ ছেড়ে চলে যাবে। তারা গত ২০১৪ সালে নির্বাচনটাও জনগণের ভোটে করতে পারেনি। এখন দেশের রাজনৈতিক অবস্থা এমন জায়গায় গিয়েছে যে, তাতে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ক্ষমতা ছাড়তে পারবে না। কারণ, সেটা তাদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। ক্ষমতা প্রত্যাশি বিএনপি ক্ষমতার বাইরে আর থাকতে পারবে না, সেটাও তাদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। একদলের জীবন হারানোর ঝুঁকি আরেক দলের সংগঠন রক্ষার ঝুঁকি। এটা তারা জানে। আপেক্ষিক অর্থে ভালো নির্বাচন হলে মানুষ আওয়ামী লীগকে ভোট দিবে না আবার বিএনপিকেও পছন্দ করে না, তাই বিকল্প খুঁজছে। বিকল্প শক্তি না থাকলে মানুষ কী করবে? বিএনপির পাল্লা ভারী হবে। সেই পুঁজি সম্বল করে বিএনপি জোট মরিয়া। আর আওয়ামী লীগ যদি জালিয়াতি করে আবার ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে, তার পরিণতিতে দেশে ভয়াবহ অরাজক পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেটা পুলিশ-র‍্যাব, বিজিবিকে দিয়ে কতটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে তা নিশ্চিত না। এই মুহূর্তে আওয়ামী লীগকে বিএনপির সাথে একটা আপসরফা করার চেষ্টা করতে হচ্ছে, সেটা নিয়ে পর্দার অন্তরালে দরকষাকষিও হয়তো চলছে। আওয়ামী লীগ এর ভাবনা হতে পারে যে, তারা শেখ মুজিবের জন্ম শতবছর ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী না করে তারা ক্ষমতা ছাড়বে না। ফলে, বিএনপিকে ঠিক করতে হবে তারা কতটা মাত্রায় এখানে আন্দোলন কিংবা সমঝোতা করবে। বিএনপি এখন মনে করছে, ভারতের আশীর্বাদ ছাড়া কূলে ওঠা যাবে না, তাই তারা সমঝোতার পথ খুঁজছেন। বিশ্ব রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারত-আমেরিকা এবং ইসরাইল একটা লবিতে আছে। চীন-ভারত একটা বৈরি পরিস্থিতিতে আছে। মিয়ানমার বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছে। ড. ইউনূসকে কেন্দ্র করে আমেরিকার সাথে আ. লীগের একটা দূরত্ব আছে। আ.লীগের নিয়ন্ত্রণে ক্ষমতা কুক্ষিগত থাকলেও পুরা রাজনীতি তার হাতে আছে এটা মনে করার কোন কারণ নাই। অনেক সিদ্ধান্ত প্রধানমন্ত্রীর অফিসও জানে না এবং জানানোর প্রয়োজনও কিছু মহল মনে করে না। দেশের গতিমুখ ডিজিটাল নির্বাচনে ফ্যাসিজম অথবা সিভিল ওয়ার, না হলে সেনা শাসনের দিকে–এর বাইরে কোন বিকল্প শাসকেরা রাখছে না। এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাবার একটাই উপায় ছিল—জোট-মহাজোটের বাইরে একটা বিকল্প রাজনৈতিক শক্তির উত্থান। যদি একটা বিকল্প রাজনৈতিক শক্তিকে দাঁড় করানো যেত, তা হলে রাজনীতির ভারসাম্য রক্ষা পেত। তারা ক্ষমতায় চলে যাবে কিনা সেটা গুরুত্বপূর্ণ না, তবে রাজনীতির গতিমুখ ফেরানো যেত। আমরা সেইভাবে বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছিলাম। এই দুই দলের বাইরে দুইটা শক্তি আছে, একটা হলো বামপন্থি শক্তি আরেকটা হলো উদারপন্থি শক্তি (লিবারেল ডেমোক্রেট)। এককভাবে কোন কিছু করার সামর্থ্য দুই শক্তির কোনটারই নাই। কিছু করতে হলে দুই শক্তির সমঝোতা লাগবে। আমরা বলেছিলাম, লিবারেল শক্তি একমঞ্চে সমবেত হয়ে একদিকে দাঁড়াক আর বাম শক্তি একদিকে দাঁড়িয়ে গণদাবিতে একই ধরনের কর্মসূচি পালন করতে থাকুক। সাধারণ মানুষের কাছে একটা সুস্পষ্ট জনকল্যানকামী অঙ্গীকার ফুটে উঠুক এবং বার্তা যাক যে, এরা সার্বিক পরিস্থিতির মোড় ঘুরানোর একটা প্রক্রিয়ায় আছে। একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ রচিত হলে যার যার আদর্শ বাস্তবায়নের পথও সহজ হবে। স্বৈরতন্ত্র ফ্যাসিবাদী আবহাওয়ায় তা দুরূহ হতে থাকবে। ফলে শক্তিশালী গণআন্দোলনের বিকাশের স্বার্থে যার যার অবস্থান স্বতন্ত্র রেখেও একটা সমঝোতা হতে পারে। জনগণের নতুন মেরুকরণ ত্বরান্বিত হতে পারে। এলক্ষ্যে সিপিবি-বাসদ-বাম মোর্চা একটা সমঝোতায় এসেছে। এর বাইরে আ. স. ম. রবের নেতৃত্বে জেএসডি, মাহমুদুর রহমান মান্নার নেতৃত্বে নাগরিক ঐক্য, বি.চৌধুরীর নেতৃত্বে বিকল্পধারা বাংলাদেশ, ড. কামাল হোসেন এর নেতৃত্বে গণফোরামসহ অপরাপর শক্তিসমূহ রয়েছে। আমরা তাদেরকে একটা সমঝোতায় আসার জন্য বলেছিলাম। এলক্ষ্যে তারা কয়েকদফা বৈঠকও করেছেন। আমাদের অবস্থা জানা ও পরিস্থিতি বোঝার জন্য দুই-একটা বৈঠকে তাঁরা আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং আমরা গিয়েও ছিলাম। সেখানে পুলিশের ঔদ্ধত্যের বিষয়টা আপনার জানেন।

পরে যখন আরেকটা বৈঠক হলো, আমরা বলেছি দ্রুত আপনাদের একটা অবস্থান তৈরি করেন। সেখানে সবাই ছিলেন এবং নীতিগতভাবে একমতও হলেন। ওনাদের বলেছি মন্দেরভালো খুঁজবে না আর আওয়ামী লীগ-বিএনপি ডাকলে কিন্তু আপনারা সে দিকে

ঝুঁকে পড়বেন না। এরকম চিন্তা থাকলে আগেই বলেন। কারণ, একটা বিকল্প যদি আমরা করতে চাই, তাহলে আওয়ামী লীগ,বিএনপি'র কোন একটাতে সামিল হয়ে তা করা যাবে না। এখন কার্যকর ঐক্য যদি গড়ে না তোলেন তাহলে একসময় এসে বলা সহজ হবে, কিছুই তো বাস্তবে খাড়া করানো গেল না, তাই একদিকে ঝুঁকে পড়ি। এইভাবে হালুয়ারুটি ও দুবৃত্তায়িত রাজনীতির অংশীদার হওয়ার আশা ছেড়ে প্রকৃত বিকল্প শক্তি দাঁড় করানোর জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। সেখানে সবাই একমত হলেন কিন্তু এগুতে পারলেন না। কারো কারো চিন্তা আছে বিকল্প শক্তি গড়তে গেলে কথিত মুক্তিযুদ্ধের শক্তি আওয়ামী লীগ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, বিএনপি লাভবান হবে, জঙ্গিবাদ মাথা চাড়া দেবে, আমাদের কী লাভ হবে? তাই আমরা এখন ঘর গুছাই, আসলে এভাবে ঘর গোছানো তো পরে, ঘর টিকানোই কঠিন হতে পারে। সেই দৃষ্টান্তও আমাদের সামনে রয়েছে। কিছু দিন আগে ড. কামাল হোসেন এর দল ছাড়াই বি চৌধুরীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হলো। এর পরে আলাদাভাবে ড. কামাল হোসেন এর উদ্যোগে ভিন্ন ঐক্য প্রক্রিয়ার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। কথা হলো, দেশের বাস্তব অবস্থা সঠিক ভাবে অনুধাবন করতে না পারলে গভীর থেকেগভীরতর সঙ্কটের দিকে যাওয়া রোখা যাবে না। ধরুন, কোনো খুনাখুনি হলো না, অথবা গোজামিল দিয়ে শাসন পরিচালনার একটা ব্যবস্থা হলো। তাতে আপাতত যে শান্ত পরিবেশ তৈরি হবে সেটা কিন্তু ভবিষ্যতে ভয়ংকর বিস্ফোরণের দিকে দেশকে নিয়ে যাবে। অশান্তির বীজ লুকিয়ে ছয় মাস অথবা এক বছরের স্থিতি কিংবা শান্তি কোনটাই কোনো অবস্থাতেই চিরস্থায়ী শান্তির লক্ষণ নয়।

তিনি বলেন, সরকার মিয়ানমারের সাথে বৈঠক করেছে। আমরা বলেছি এককভাবে তাড়াহুড়া করবেন না। কিন্তু কাজের চেয়ে প্রচারের দিকে এদের ঝোঁক বেশি। কাজের কাজ যা করবেন এর চাইতে বেশি হচ্ছে তাদের প্রচার। মিয়ানমার বললো, দুই শ হিন্দু শরণার্থী ফেরৎ নিবে। তারা এটা করেছে ভারতকে সন্তুষ্ট করার জন্য। অথচ দাবি করা হয় ভারতের সাথে আমাদের গভীর বন্ধুত্ব। ভারত তো জাতিসংঘে মিয়ানমারের নির্যাতনের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়নি। চীন এবং ভারতকে নিয়ে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যে কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনা বহু হিসাব নিকাষের মাধ্যমে করার দরকার ছিল তা সফলতার সাথে করা যায়নি।

এদের কাণ্ডজ্ঞানের অবস্থা দেখুন—মিয়ানমারে নির্যাতনের ফলে লাখ লাখ মানুষ বাংলাদেশে ঢুকে পড়ছে আর খাদ্যমন্ত্রী চাল কিনতে সেখানে গেল। দুনিয়ার সামনে এর বার্তা কী যায়? চাল কি আর অন্য কোনো দেশে পাওয়া যেত না। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মিয়ানমারে সফর করার সংবাদ কি বাংলাদেশ সরকার জানতো না? যাওয়ার আগে তার সাথে একটা আলোচনা হওয়ার দরকার ছিল। এরকম পরিস্থিতিতে ভারত যদি মিয়ানমারের পক্ষে অবস্থান নেয় তাহলে বাংলাদেশের জন্য এই অবস্থা মোকাবেলা করা সহজ হবে না। কিন্তু বাংলাদেশ কার্যকর কিছুই করল না। চীনকে কনটেইন করার জন্য এখানে আমেরিকা প্রবেশ করতে চায়; ফলে, চীনের একটা বিরোধ আছে, আবার মিয়ানমারের সাথে চীনের অর্থনৈতিক এবং ভূ-রাজনৈতিক সম্পর্ক আছে আবার তার সাথে ভারতের বিরোধ আছে। যেহেতু সরকার ভারতের কাছে আষ্টেপিষ্ঠে বাধা রয়েছে, ফলে চীনের সাথে মিমাংসা ধীর গতি পেল। একথা ঠিক, গত নির্বাচনের সময় আমেরিকা যখন বাংলাদেশের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা শুরু করেছিল তখন ভারত বলেছিল দেখ—আমাদের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোকে নিরাপত্তাহীন করতে পারব না, সুতরাং তোমরা বাংলাদেশের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। আমরা এ মুহূর্তে আওয়ামী লীগের বিকল্প কিছু ভাবছি না। এরকম জোরাল অবস্থান যখন ভারত নিয়ে নিল খুব স্বাভাবিকভাবেই তখন আমেরিকা পিছু হটলো। রাজনীতির মধ্যে ন্যায্যতা ছাড় দিয়ে নমনীয় হলে অথবা একতরফা ছাড় দিলে তার খেসারত দিতে হয়। যা বাংলাদেশকে দিতে হচ্ছে। এছাড়া আভ্যন্তরীণ রাজনীতির গণঐক্যের দুর্বলতা তো রয়েছেই।

এখন আসাম থেকে বাংলাভাষী বিতাড়নের একটা চক্রান্ত চলছে। ভারত সরকার বলে রেখেছে, যে সব হিন্দুরা বাংলাদেশ থেকে ভারতে যাবে তারা তাদের নাগরিকত্ব দিবে। বাস্তবে যদি আসাম থেকে বাঙালি খেদাও আন্দোলন আবার জেগে ওঠে, তা হলে পরিস্থিতি কেমন জটিল হয়ে উঠবে? একদিকে রোহিঙ্গা শরণার্থী অন্য দিকে আসামের মুসলমান যদি ঢোকে এর চাপ কী ভয়াবহ হবে? মিয়ানমারকে কেন্দ্র করে চীন-ভারতের জটিলতা, আমেরিকার নানা উদ্যোগ এবং দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অবস্থা, বৈদেশিক হস্তক্ষেপকে অপরিহার্য করে তুলবে। এগুলো নিয়ে সরকার দলের কোন উদ্যোগ-ভাবনা দেখছি না। এখন শুধু উন্নয়নের জিগির তুলছে। কিন্তু এই উন্নয়ন কার? উন্নয়ন করে কে আর বগল বাজায় কে? উন্নয়নের আলোচনা চলছে কিন্তু যারা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি সেই প্রবাসী শ্রমিক, কৃষক আর গার্মেন্টস শ্রমিকের অবদানের কোন আলোচনা নেই।

আমাদের এক কোটি লোক প্রবাসে কাজ করে, তারা সেখানে যা আয় করে, অন্যান্য দেশের অর্ধেক মানুষ তার সমান আয় করে। এই শ্রমিকদের দক্ষ করলে তারা দ্বিগুণ আয় করতে পারতো। সরকারের সেদিকে মনোযোগ নেই আর ঝুঁকিপূর্ণ কর্মপরিবেশে কাজ করে লাশ হয়ে দেশে আসে। ছয় হাজার লোক বিভিন্ন দেশে জেল খাটছে। শ্রমিকদের সমস্যা না দেখে আমাদের দূতাবাসের কর্মকর্তাদের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায় দেশ থেকে যাওয়া শাসকদলের কর্তাব্যক্তি, মন্ত্রী-এমপিদের তদারকি করা ও তাদের নিয়ে বেড়ানো। পরাধীন আমলে পাকিস্তানি ২২ পরিবার বাংলাদেশ থেকে টাকা লুটকরে তাদের নিজ দেশে নিয়েছে আর আমাদের দেশের লুটেরারা টাকা লুট করে বিদেশে পাচার করে।

প্রণব মুখার্জী একটা বই লিখেছেন : সেখানে বলেছেন, তিনি বাংলাদেশের দুই নেত্রীকে পথে আনার এবং বাংলাদেশের রাজনীতিকে গণতান্ত্রিক পথে আনার চেষ্টা করছেন। তারপরও এদের লজ্জা নেই, এবার আবার এসেছেন। এর আগে খালেদা জিয়া দেখা করেননি,

এখন বিএনপি কাফফারা দিয়ে এই জটিলতার একটা নিষ্পত্তি চায়। বিজেপি পশ্চিম বাংলায় ছিল না এখন সেখানে ঢুকতে চায়। আর সেখানে ঢুকতে হলে হিন্দুত্ববাদকে জাগাতে হবে। আর হিন্দুত্ববাদকে জাগাতে হলে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা জাগাতে হবে। সরকার এগুলো দেখেও নির্বিকার বসে আছে। আওয়ামী লীগের কাছ থেকে যা পাওয়ার তারা তা পেয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের জনগণের যা পাওয়ার আমরা তো তার কোনটাই পাইনি। ফলে দেশের মানুষের মধ্যে যদি ঐক্য না থাকে তা হলে বাইরের পরিস্থিতি আমরা মোকাবেলা করবো কীভাবে?

এখন আওয়ামী লীগ প্রচার করছে দেশের অগ্রগতির জন্য তাদের ক্ষমতায় থাকতে হবে। তাদের মনোভাব হলো তারা সামরিক বাহিনীর হাতে ক্ষমতা ছাড়তে রাজি কিন্তু রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের কাছে নয়। এর আগ পর্যন্ত তারা তাদের মতো করে সব চেষ্টা করবে।

দেশের সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো দুমড়ে-মুচড়ে গেছে। বিচারপতিদের অভিশংসনের ক্ষমতা সংসদের হাতে রেখে সংবিধানের যে ষোড়শ সংশোধনী হয়েছিল তা অবৈধ বলে রায় দিয়েছেন দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট। ষোড়শ সংশোধনীর আগে বিচারপতি অপসারণে বাংলাদেশের সংবিধানে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠনের বিধান ছিল। সংশোধনীর বাতিলের রায়ের কারণে বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহাকে নিয়ে সাংসদরা পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে কি অসত্য কথাই না বললো। তারা বললো, বিচারপতি পার্লামেন্টকে অপদস্ত করেছে। হাইকোর্টের রায়ের মধ্যেই বলা হয়েছে, সরকারের অধিকাংশ এমপির বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ আছে। বলছে ৭০ ভাগ এমপি ব্যবসায়ী, এটা পত্রিকার মাধ্যমে এসেছে। এটর্নি জেনারেল এবং ডেপুটি এটর্নি জেনারেল এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে নাই। এটা হলো হাই কোর্টের পর্যবেক্ষণ। সুরেন্দ্র কুমার সিনহা বরং তার পর্যবেক্ষণে বলছেন, এইভাবে মন্তব্য করা উচিৎ নয়। কারণ রাষ্ট্রের যে তিনটা অঙ্গ, প্রত্যেকটার প্রতি প্রত্যেকটার পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ থাকা উচিৎ। এটা অপ্রত্যাশিত ও অমর্যাদাকর বিধায় তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

সংসদ সদস্যরা পার্লামেন্টে বলেছেন, প্রধান বিচারপতি বঙ্গবন্ধুকে অপমান করেছেন। অথচ তিনি বলেছেন, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এমন একটা দেশ পাওয়ার নজির পৃথিবীতে পাওয়া যাবে না। যদি আমরা জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে চাই, তা হলে আইনের শাসনের ওপর ভরসা রেখে আমিত্ব পরিহার করতে হবে। রায়ের কোথায়ও শেখ মুজিবের অপমান নেই। এরপর তার বিরুদ্ধে ১১টা দুর্নীতির অভিযোগ আনা হলো। যদি প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকে সেটা সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে যাবে। সিনিয়র বিচারকের নেতৃত্বে জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠিত হবে। রাষ্ট্রপতি সেটা না করে পাঁচ জন বিচারককে ডেকে বললেন, প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে ১১টা দুর্নীতির অভিযোগ আছে। তিনি কি এভাবে ডেকে কথা বলতে পারেন? পারেন না। এরপর পাঁচ জন বিচারপতি একই সুরে বলতে শুরু করলেন, আমরা প্রধান বিচারপতির সাথে একত্রে বসব না। এটাতো শিশুদের মান অভিমান সুলভ খেলা হতে পারে না! এতে বিচারিক মনের প্রতিফলন ঘটে না। বরং সর্বোচ্চ আদালতেরও অধীনতামূলক পরিবেশ রচিত হয়। বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা নেমে যায়। নির্বাচন কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, মানবাধিকার কমিশন, তথ্য অধিকার কমিশন, আইন কমিশন, পুলিশ প্রশাসন সবগুলোর এখন নাজেহাল দশা।

শিক্ষকরা শহিদ মিনারে-প্রেসক্লাবের সামনে তাদের দাবিতে অনশন করছেন। অর্থমন্ত্রী বললেন, যে সব শিক্ষক রাস্তায় রয়েছে তাদের দাবিপূরণ সম্ভব না। এটাতো শিক্ষা সম্পর্কে একটা নীতিগত সিদ্ধান্তের ব্যাপার। পাহাড় থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ারমতো শিক্ষার মান পড়ে যাচ্ছে। প্রশ্ন ফাঁস মহামারি রূপ নিয়েছে। সরকার একজন ডেপুটি সেক্রেটারিকে ৩০ লাখ টাকা সুদমুক্ত ঋণ দিয়েছে গাড়ি কেনার জন্য, ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে গাড়ি ব্যবস্থাপনার জন্য এবং তাদের জন্য একজন দারোয়ান, একজন বাবুর্চি দুই জনের উপার্জনের সমপরিমাণ ৩২ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। তার মানে সরকার স্বীকার করে নিয়েছেন একজন দারোয়ানের বেতন ১৬ হাজার টাকা। তা হলে আমাদের গার্মেন্টস শ্রমিকের বেতন কত? চা বাগানের শ্রমিক-গ্রাম পুলিশ, অবিভাগীয় ডাক কর্মচারীদের বেতন কত? এগুলোর জবাব কী? আগামী নির্বাচনে আমলাদের কাজে লাগানোর আগাম ইঙ্গিত কি এগুলি? অথচ জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য গণতান্ত্রিক আইনের শাসন, ৪৬ বছরেও নিশ্চিত হলো না। মৌলিক অধিকারগুলো আইনি বাধ্যবাধকতায় প্রতিষ্ঠিত হলো না।

রাজনৈতিক দুর্বৃত্তের শক্তির চাইতে যদি জনগণের শক্তিকে বড় করা না যায়, তা হলে তাকে পরাজিত করা যায় না। ৫৪ সালে গণতান্ত্রিক শক্তির বিজয় নিশ্চিত করা এবং মুসলিম লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষ্যে যুক্তফ্রন্ট গঠন এবং ৭০ সালের নির্বাচন তার প্রমাণ। স্বৈরাচারী শাসকরা মানুষকে তখন নানাভাবে বিভ্রান্ত করেছিল। কিন্তু জনগণ তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছিল ফলাফল, নির্বাচনে ২৩৭টি আসনের মধ্যে ২২৩টিতে যুক্তফ্রন্টের জয়লাভ। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আমরা ফাতেমা জিন্নাহকে সমর্থন করি, তখন বলা হয়েছিল আমরা একজন মহিলাকে কেন সমর্থন দিচ্ছি। দ্বিতীয়ত আইয়ুব খান না থাকলে দেশ রক্ষা করবে কে? সে সময়ে ৬৬ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে '৬ দফা দাবি' উত্থাপন করা হয়, কিন্তু তখন এদাবি নিয়ে আমাদের কথাই বলতে দিচ্ছিল না। ১৯৫৮ সাল থেকে ৬৯ সালে আইয়ুব খান এর উন্নয়ন দশক পালন করা হয় আর উন্নয়নের বিভিন্ন মডেল দেখানো হয়। তখন আমাদের বিরুদ্ধে প্রচার করা হলো—আমরা ভারতের অনুচর, উন্নয়ন বিরোধী ইত্যাদি। ৬৫ সালে যখন ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হয়, তখন বলছিল আইয়ুব খান না থাকলে কে এই যুদ্ধ পরিচালনা করতো। মওলানা ভাসানী তখন বলেছিলেন, যুদ্ধচলাকালীন সময় পূর্ব পাকিস্তান ছিল সম্পূর্ণ অরক্ষিত। যদি ভারত পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করতো তা হলে তারা দখল করে নিতে পারতো। ভাসানী দাবি করেছিল নৌ-বাহিনী ঘাটি এখানে কর, বাঙালিদের মধ্য থেকে সৈন্য নিয়ে সামরিক বাহিনী গঠন কর—তারা তা

করেনি। পরে তিনি বললেন, পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী দেখে না। ফলে, বাঙালিদের স্বার্থ বাঙালিদের দেখতে হবে। এর মধ্যদিয়েই রাজনৈতিক আবহাওয়া ঘুরতে শুরু করলো। ৬৬ সালের পর ৬৭ সাল গেল হতাশাময় সময়। আওয়ামী লীগের ওয়াকিং কমিটির মিটিংএ কথা ওঠেছিল, ভোটের জন্য, জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবার জন্য শেখ মুজিবকে দাঁড়ি রাখা ও টুপি পরা দরকার। তাজউদ্দীন সাহেবসহ অনেকে এর বিরোধীতা করেছিলেন। শেখ মুজিব দাঁড়িও রাখেনি টুপিও পরেনি। তাতে আন্দোলনের সমস্যা হয়নি। স্বাধীনতা আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা হতেও তার আটকায়নি। অথচ এখন সে দলকে ধর্মীয় মুখোশ পরার ভান করতে হচ্ছে। সে সময় পরিবেশটা এই রকম ছিল, যেন আইয়ুব খান চিরকাল থাকবেন। কিন্তু এর মধ্যেই পরিস্থিতি ব্যাপকহারে পাল্টাতে থাকে। সরকারের পক্ষ থেকে আন্দোলনকারীদের ওপর আক্রমণ চলতে থাকে। ২০ জানুয়ারি ছাত্রদের মিছিলে গুলি করে হত্যা করা হয় আসাদকে। ২৪ জানুয়ারি গণঅভ্যুত্থানে আইয়ুব সরকারের পতন হয়। ১৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলার আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে ক্যান্টনমেন্টে গুলি করা হয়, পরে ওই দিনই তিনি মারা যান। ১৮ ফেব্রুয়ারি '৬৯ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ড. শামসুজ্জোহাকে হত্যা করা হয়। পরবর্তীতে গণআন্দোলনের চাপে আইয়ুব গেল কিন্তু সামরিক শাসন গেল না, ইয়াহিয়া আসলো।

এর মধ্যেই জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেল এবং গ্রাম-ইউনিয়ন, থানায় সংগ্রাম কমিটি গড়ে উঠতে থাকলো। এই যে গণশক্তি সেটা যখন বড় হয়ে দেখা দেয় তখন অগণতান্ত্রিক শক্তিকে পরাস্ত করা যায়। আজকেও এই রকম একটা নাই নাই সময় চলছে। কিন্তু এটা শেষ কথা না। এই অবস্থার যারা পরিবর্তন চান, এই পরিবর্তনের লক্ষ্যে যারা কাজ করছে, আপনারা তাদের পক্ষে দাঁড়ান, শিক্ষার দাবিতে যে ছাত্ররা আন্দোলন করছে, মজুরির দাবিতে যে শ্রমিকরা আন্দোলন করছে, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে যারা আন্দোলন করছে, জনজীবনের অন্যান্য সংকট নিয়ে যারা আন্দোলনে আছে আপনারা তাদের পক্ষে এবং পাশে দাঁড়ান। আমরা যারা দেশ স্বাধীন করেছি আমরা কি চাইতে পারি, রাস্তায় রাস্তায় মানুষের লাশ পড়ে থাকুক। এখানে চরম ফ্যাসিবাদী শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে এটা মানুষ চায় না। সামরিক বাহিনী আবার ক্ষমতায় এসে বসে পড়ুক এটাও মানুষ চায় না। তবে দুর্বৃত্তায়িত শক্তিকে যদি মোকাবেলা না করা যায়, তাহলে এরা সংঘাত গ্রামে গ্রামে, পথেপ্রান্তরে ছড়িয়ে দিবে। জনগণকে বিভক্ত করে নিজেদের পক্ষে জিম্মি করবে এবং এর মধ্য দিয়ে তারা তাদের রাজনীতির ক্ষমতা দখল করবে। এর অংশ হিসেবে একদিকে প্রকাশ্য তাণ্ডব, জাল-জালিয়াতি, জবরদখল অন্যদিকে চক্রান্ত ষড়যন্ত্র চলছে যা রাজনীতির পরিবেশকে বিষাক্ত করে ফেলছে। এখন হয় লুটপাটের ব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হবে অথবা এর বিপরীতে জনগণের শক্তি দাঁড়াবে। এই রকম একটা পরিস্থিতিতে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। এই অবস্থায় কোন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, গণতন্ত্রমনা ও প্রগতিবাদী মানুষ দুঃশাসনের পক্ষে দাঁড়াতে চায় না। ফলে, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের যে অঙ্গিকার জনগণের ক্ষমতায়ন, লুটপাটমুক্ত সাম্যসমাজ সেটাকে লক্ষ্যে রেখে আমাদের এগুতে হবে। আপনাদের আলোচনার মধ্যদিয়ে এই সুরটাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। প্রত্যেকের কথার ধরন আলাদা কিন্তু সুর একটাই। আমাদের এখন জনগণের সামনে নীতিনিষ্ঠ একটা দৃশ্যমান বিকল্প শক্তিকে দাঁড় করাতে হবে। এই পরিস্থিতিতে যদি নির্বাচন হয়ও তার তিনটা পর্যায়ে—নির্বাচনের আগে, নির্বাচনের সময় এবং নির্বাচনের পরে কোন না কোন এক পর্যায়ে একটা নিয়ন্ত্রণের অযোগ্য সংঘাতময় পরিস্থিতি তৈরি হবেই মনে হচ্ছে। আমাদের যে লক্ষ্য সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে, অবশ্যই গণতান্ত্রিক পরিবেশ লাগবে। গণতন্ত্রহীন-সংঘাতময় এই ধরণের পরিস্থিতিতে সমাজতন্ত্রের আন্দোলন পিছিয়ে যায়। কারণ মানুষের সুস্থ চিন্তার জন্য একটা সুস্থ পরিবেশ লাগবে, একটা সংঘাতময় পরিস্থিতিতে সুস্থ চিন্তা কার্যকারিতা পায় না।

তিনি বলেন, অনেকে ভাবেন বাংলাদেশে মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ আজ প্রধান সমস্যা। ফলে এর বিরুদ্ধেই আজ সর্বাত্মক সংগ্রাম জরুরি। কিন্তু তারা বুঝে না যে, মৌলবাদ-জঙ্গিবাদ, পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদেরই সৃষ্ট। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মূল সংগ্রামের সাথেই অনুসঙ্গ হিসেবে মৌলবাদ বিরোধী সংগ্রাম করতে হবে। তাছাড়া আমাদের দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য-মনন, অন্য দেশের সাথে মিলবে না। আমাদের এখানে যে, শ্রী চৈতণ্যের ভক্তিবাদ, লালনের মরমীবাদ, সুফিবাদ, সিলেটের হযরত শাহ জালাল, মঈনউদ্দীন চিশতি এরা ইসলাম প্রচার করেছে, এদের চিন্তাভাবনা আর ওহাবিবাদী চিন্তাভাবনা এক নয়। আমাদের দেশে ইসলামের ভাবাদর্শ, সেটা ওহাবিদের দ্বারা প্রচারিত হয়নি। যে ওহাবিবাদ হাসান বান্না মিশরে, পাকিস্তানের মওদুদী এবং গোলাম আযমরা মিলে আমাদের এখানে আনার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আমাদের এখানকার মাটি-আবহাওয়া সে জিনিসের অনুকূল নয়। এখানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব আছে, জৈন ধর্মের প্রভাব আছে। মোগল শাসক আকবর সুফিবাদী তো বটেই একটা নতুন ধর্ম সমন্বয়বাদী ধর্ম দীন এ এলাহি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। জনগণের প্রতিরোধ দুর্বল করার জন্য ব্রিটিশ শাসকরা এখানে ধর্মীয় বিভেদ চাঙ্গা করেছে। কিন্তু রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, আ. রহিম ডাহরি, আমীর আলী, রবীন্দ্র, নজরুল, বেগম রোকেয়াসহ অসংখ্য মনীষীর আলো ছড়ানো এই দেশ। স্বাধীনতা সংগ্রামে লক্ষ লক্ষ শহিদের রক্তস্নাত এই দেশ। ফলে, আমাদের জমি জঙ্গিবাদ বা সাম্প্রদায়িকতার উর্বর ভূমি নয়। শাসকরা মদদ না দিলে পৃষ্ঠপোষকতা না দিলে, জঙ্গিবাদী শক্তি এখানে দাঁড়াতে পারবে না। ইতিহাস বলছে সাম্প্রদায়িক শক্তি বারে বারে পরাস্ত হয়েছে। তারা স্বাধীনতা পূর্বকালে শ্লোগান নিয়ে এসেছিল তোমার আমার ঠিকানা মক্কা-মদিনা কিন্তু সে শ্লোগান টিকে নাই। প্রতিষ্ঠা পেল তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা-মেঘনা-যমুনা; নারায়ে তকবির এর জায়গায় স্থান পেল জয় বাংলা। আজকেও আমাদের গণতন্ত্র ও সমাজবদলের সংগ্রামে সকল বাম-প্রগতিশীল-গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্য দরকার; কারণ, দুর্নীতি-দুঃশাসন দখলবাজির কারণে মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে অর্জিত দেশকে আমরা ধ্বংসের দিকে যেতে দিতে পারি না। গণআকাঙ্ক্ষার বিপরীতে দেশকে বহুদিন চালানো হয়েছে, আমরা বিপৎজনক পরিস্থিতিতে পড়েছি, আমরা আর পিছাতে চাই না। এটার রাশ টানতে হবে। সমস্ত জায়গা থেকে যদি আওয়াজ না উঠে, তবে দেশের জনগণকে জিম্মিদশা থেকে মুক্ত করা যাবে না। আমরা নীতিনিষ্ঠ ঐক্যের চেষ্টা চালিয়ে যাব, তাছাড়া কোন বিকল্প রাস্তা নাই। এই সংগ্রামে আপনাদের সবার অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার আহ্বান রেখে শেষ করছি। ধন্যবাদ।